যাচাই

(গল্পগ্রন্থ – অনুসন্ধান)

গোরুর গাড়ি ঢুকল চাঁদপুর গ্রামের মধ্যে। ননীবালা ছেলেকে বললে—

—বাবা, চেয়ে দ্যাখো—

—ঘুমুই নি মা। চেয়ে আছি।

—এই গাঁয়ের সীমানা। ওই গেল দুলেপাড়া—

—ব্রাহ্মণপাড়া কতদূর ?

—আরো আগে।

ননীবাবুলার সারা দেহে মনে একটি অপূর্ব অনুভূতিরশিহরণ !

মনে পড়ল আজ ত্রিশ-বত্রিশ বছর পূর্বে এই গ্রামে নববধূরূপে ঢুকবার সেই দিনটির কথা। তিনি ছিলেন পাশে—আজ যেমন ছেলে সুরেশ তার পাশে বসে রয়েছে। তেমনি মুখচোখ, তেমনি চোখের দৃষ্টি, বয়েসও তাই।

চাঁদপুর গ্রামে ঢুকবার কিছু পরেই কাককোকিল ডেকেভোর হয়ে গেল।

সুরেশ গাড়ি থেকে নেমে গাঁয়ের পথের ধুলো তুলেমাথায় দিলে।

মাকে বললে—তোমরা কতদিন গাঁ থেকে গিয়েছিলে ?

—তোর বয়েসে।

—একুশ বছর ?

—হ্যাঁ, ওঁর স্কুলের চাকরি গেল—আমরা এখানকারমায়া কাটালুম।

—বাবা দুঃখ করেন নি ?

—আহা ! মরবার আগেও প্রায়ই বলতেন—বড় বৌ, একবার যদি চাঁদপুর যেতে পারতাম ফিরে, তবে বোধহয় কিছুদিন আরো বাঁচতাম। ওখানে এখনো চৈত্র মাসের দুপুরে বুড়িরা কুলচুর শুকুচ্চে রোদ্দুরে। বাঁশবনে কত কোকিল পাপিয়া ডাকছে। আমি গাঁয়ে যাবো। শহরের ছোট্ট বাসার মধ্যে উনি চিরকাল হাঁপিয়ে এসেচেন। আর তেমনি গরম সেখানে।

আমি যদি তখন বড় হতাম, বাবাকে বাবার জন্মভূমিতে ঠিক নিয়ে আসতাম বলে দিচ্চি।

সুরেশ ছিপছিপে চেহারার শক্ত হাতপাওয়ালা যুবক। ফুটবল খেলে ভালো। দেশ স্বাধীন হবার পরে রাইফেল ক্লাবে যোগ দিয়ে খুব রাইফেল ছোঁড়া অভ্যেস করচে।এইবার রেলের শিক্ষানবিশি শেষ করে ভালো চাকুরি একটা পাবে। শিক্ষানবিশির সময়েই ও খেলোয়াড় হিসেবে রেলের উপনিবেশের শহরটির অনেক বড় বড় অফিসারের দৃষ্টি আকৃষ্টকরেচে। শিক্ষানবিশির ছাত্রও সে ভালো—অঙ্ক বেশ ভালো জানে বলে অঙ্কের টুইশানিতে মাসে আজকাল সত্তর আশিটাকা রোজগার করে।

স্বামী মারা গিয়েচেন আজ দশ এগারো বছর। সুরেশতখন দশ বছরের ছেলে, নিচের ক্লাসে পড়ে। কি আতান্তরেই ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন। মনে হয়নি যে আবার একদিন এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। রেল উপনিবেশের সকলেইখুব দয়া করলেন। একটা বাসা দেখে দিলেন, কারণ রেলের কোয়ার্টার ছাড়তে হল, ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর হরিচরণ বসু নিজে দেখাশুনো করলেন। সুরেশের লেখাপড়াযাতে বন্ধ না হয়, যাতে এ গরিব অসহায় পরিবারটি অনাহারের পথ থেকে রক্ষা পায়—এ সমস্তই ওখানকার বড় বড় লোকেরা করলে। সে সব দিনের কথা ভাবলে জ্ঞান থাকে না। এমন দিনও আসে মানুষের জীবনে।

আজ মনে হচ্চে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এসে অদূরে এবার কূলরেখা যেন দেখা দিয়েচে। ওরা সবাই বলে আমাদের দেশএখন স্বাধীন, আর সে যুগের মতো কষ্ট করতে হবে না। এখন ছেলেপিলেদের ভালো চাকুরি

হবে, চাকুরিতে উন্নতি হবে, আগের মতো অল্প মাইনেতে ঘষটাতে হবে না। না খেয়ে মরবে না কেউ এ স্বাধীন ভারতের মাটিতে। অনেক বড় বড় আশার কথা সে শুনেচে, ছেলে-ছোকরারা কত মিটিং করে, বক্তৃতাদেয়। গান্ধীজীর ছবিতে মালা দিয়ে গান করতে করতে শহর ঘুরে বেড়ালো এই তো সেদিন। তার মৃত্যুর পরে সেদিন এক বৎসর বুঝি ঘুরলো। সুরেশও চমৎকার গান গাইতে পারে। আরএকটা গান গায় সুরেশ, গান্ধীজী নাকি বড় ভালোবাসতেন। সবাই বলে, রামধনু গান।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম

পতিতপাবন সীতারাম।

ভোরের আলো বেশ ফুটেচে। সামনের পুরোনোকোঠাবাড়িটা থেকে একজন বার হয়ে এসে পথের ওপরদাঁড়িয়ে ওদের গরুর গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। ননীবালা চুপিচুপি বললে—ও সুরেশ, ওই বোধহয় তোর বিনোদ কাকা, ওঁর খুড়তুতো ভাই। আমি চিনেচি। তুই এগিয়ে যা। পরিচয় দিয়ে প্রণাম করবি। ওঁকেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

মিনিট পনেরো কেটে গেল উভয়ের কথাবার্তায়— সুরেশ আর তার বিনোদ কাকার। তারপর বিনোদকাকা এগিয়েএসে ননীবালাকে আদর করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বহুদিন পরে গ্রামের বৌ গ্রামে ফিরে এসেচে। আজকুড়ি-একুশ বছর পরে। গ্রামের বৌ-ঝি দেখা করতে এলএপাড়া ওপাড়া থেকে। অভয় নাপিতের বৌ এসে বললে—ও বৌ, কেমন আছ ? খোকা কই ?কতবড় হয়েচে দেখি ! দাঁড়াও, একটু পায়ের ধুলো দ্যাও দিনি আগে !

তারপর দুই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সে সামনেবসলো।

অভয়ের বৌকে দেখে ননীবালা যেমন আশ্চর্য হয়ে গেলতেমনি মনে মনে কেমন এক ধরনের দুঃখও হল। অভয়ের বৌতার চেয়ে অন্তত কুড়ি পঁচিশ বছরের বড়, তার মার বয়সী, চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে—শুধু ধাত ভালো আছে বলে অত বয়েস বোঝা যায় না—কিন্তু অভয়ের বৌ এখনো সধবা। পাকাচুলে সিঁদুর পরচে। অভয় নাপিত এখনো বেঁচে থাকবে সেটাভেবে দেখলে এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়, বড় জোর সত্তর বাহাত্তর না হয় তার বয়েস হয়েচে—কিন্তু—

এ কিন্তু'র কোনো সান্ত্বনা ননীবালা মনের মধ্যে খুঁজেপেলেনা।ওঁর কি মরবার বয়েস হয়েছিল ?পরদিন সে দেখলে, শুধু অভয় নাপিতের বৌ নয়, তার চেয়ে অনেক বড় বয়সে বৌ এখনো দিব্যি সিঁদুর পরছে পাকা আধপাকা চুলে। কেন চলেগেলেন অল্প বয়সে ওদের বিদেশে ভাসিয়ে ? গ্রামের মেয়েরাযখন দেখা করতে আসে, তখন বার বার ওই কথাটাই মনে হয় ওর।

ননীবালার শ্বশুরবাড়ি বিনোদ কাকাদের বাড়ির দক্ষিণগায়ে। কুড়ি একুশ বছর ধরে সে বাড়িতে কেউ না থাকায় উঠোনে একগলা নোনা, ভাঁট, সেঁউতি লতার জঙ্গল, জংলীডুমুরের বড় গাছে ডুমুর ফলচে পাঁচিলের মাথায়, জানালায় কাঁটালতা উঠে জানালার কবাট ঢেকে ফেলেছে।

সুরেশ কেবলই বলছিল, মা, আমাদের নিজের বাড়িতেচলো গিয়ে। গ্রামে এসে পরের বাড়িতে থাকব কেন?

আজ তিন চার দিনে জঙ্গল কাটিয়ে উঠোন পরিষ্কার করে তবে ননীবালা নিজেদের ভিটেতে ঢুকলো।

মাত্র তিনখানি ঘর, দুটো বারান্দা দুদিকে, ভাঁড়ার-রান্নাঘর আলাদা। কতকাল পরে আবার এ ভিটের মাটিতে সে পা দিল ?দীর্ঘ একুশ বছর। এতও তার জীবনে ঘটবার ছিল !

সুরেশ বলে—কই মা, আমার তো কিছু মনে নেই এবাড়িতে থাকবার কথা ?

ননীবালা বলে—দুর, তোর বয়েস যখন ন মাস তখন এবাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই যে।

—এখন এখানে কিছুদিন থাকো মা। আমার বড্ড ভালো লাগচে।

—থাকতেই তো এলাম। এখন মা মঙ্গলচণ্ডী যা করেন।

ননীবালা সারাদিন ঘর ঝাড়ে পোঁছে সাজায়। আজ একুশবছরের ধুলোর স্তর পড়েচে ঘরখানার ওপর। কেবলই ওর মনে পড়চে আজকাল ওদের বিবাহিত জীবনের সেই মধুমাখা দিনগুলি—নববধূর নতুন স্বপ্নমাখানো অপূর্বরাত্রি ও দিনগুলি।

উনি তখন একেবারে তরুণ, সে চোদ্দ বছরের কিশোরী।

ওই তো সেই কুলুঙ্গিটা! ওটাতে উনি একদিন রসগোল্লাএনে লুকিয়ে রেখে মজা করেছিলেন। একটা বিলিতি ওষুধের কাগজের বাক্সের মধ্যে রসগোল্লা ছিল লুকোনো। উনি বলেছিলেন—কি বলো তো ওতে ?

প্রগম্ভ নববধু বলেছিল—তোমার জিনিস তুমিইজানো। ও তো একটা বিলিতি ওষুধ।

—বাজি ফেলবে?

—অতশত আমি বুঝি নে। কি ওতে ?

—রসগোল্লা।

—হাতি !

—গা ছুঁয়ে বলচি। এই দ্যাখো—ক'টা খাবে বল।

তারপর দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই রসগোল্লাখেয়েছিল—ত্রিশ বছর আগের কথা। মনে হচ্ছে কালঘটেচে। এখানে বসে বড্ড বেশি করে স্বামীর কথা মনেপড়চে ননীবালার। সব ঘরে, সব বারান্দায়, প্রতি কোণে, ওই রান্নাঘরের খেতে বসবার বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানায় ওর নববধূজীবনের স্মৃতি মাখানো। তরুণ স্বামী সেখানে ঘুরচেন এঘরে ওঘরে, ও নিজে সেখানে ব্রীড়ানম্র কুণ্ঠিতা কিশোরীবধূ, নতুন প্রেমের স্পর্শে দুরুদুরু বুক নিয়ে আলতাপরা পায়ে এঘরে ওঘরে গৃহকাজ করে বেড়াচ্চে নবীন উৎসাহ নিয়ে।

ননীবালার মনে হচ্চে যেন ওঘরে গেলেই দেখবে তিনি বসে আছেন তক্তপোশে, আবার ওঘরে থাকলে মনে হয় বুঝিএঘরে এলেই দেখা পাবে। আগেকার দিনের মতো লুকোচুরি খেলা এখনো কি চলচে ?

একবার উনি নতুন ধানের শিষ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দাও। নতুন জমির নতুনধান। শাঁখ বাজাও, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা করা নিয়ম তোমার।

ঠিক দুপুরের গম্‌গম্‌ রোদে অলস নিমফুলের গন্ধেরমধ্যে কতকাল আগের তার কথাই মনে পড়ে। ননীবালা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাঁশঝাড়ের ঘন ডালের দিকে, কিন্তু মনতখন অতীত দিনের কোনো আবেশাতুর মুহূর্তটিতে স্থিরনিবদ্ধ।হয়তো সে সময় ছেলে সুরেশ বলে ওঠে—মা, একটু খাবার জল দাও না। ননীবালা চমকে ওঠে ধ্যান ভেঙে, লজ্জা পায়পাছে ছেলে কিছু বা বুঝে ফেলে। ছেলেকে জল দিয়ে হয়তো কাঁথা সেলাই করতে বসে গেল, কিংবা নতুন পাড়া তেঁতুলের রাশ বাঁটি পেতে কাটতে আরম্ভ করে দিলে।

অমনি মনে পড়ে যায় সেই সব দিনের এমন চৈত্রের দুপুরে—

বাড়ির পেছনের গাছের তেঁতুলের রাশ এমনি কাটতেবসেছিল একদিন।

উনি পেছন থেকে এসে চুপিচুপি বললেন—তেঁতুলকাটা রাখ। নুন দিয়ে নেবুপাতা দিয়ে তেঁতুল জরাও দিকি বেশকরে।

—চুপ। মা টের পাবেন। পালাও তুমি। তেঁতুল খেলেজ্বর হয়।

—ইস ! উনি যেন আর খাবেন না, একলা আমি খাবো কিনা ! মা ঘুমুচ্চে। তুমি তাড়াতাড়ি ওঠো তো লক্ষ্মীটি। জিভেজল আসচে না তেঁতুলের নামে ? সত্যি কথা বলো।

ননীবালাকে উঠে যেতে হয় কাটা তেঁতুল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে। উনি বলেন—দাঁড়াও, আমি নেবুপাতা নিয়ে আসচি।তেঁতুলগুলো একটু ধুয়ে নিয়ে, বড় বালি কিচ্‌কিচ্‌ করবে নইলে—

ননীবালা ধমকের সুরে বলে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সর্দারি করতেহবে না ! তেঁতুল ধুয়ে কেউ জরায় না। জিগ্যেস করো গিয়ে। পানসে হয়ে যায়।

দুজনে কাড়াকাড়ি করে সেই একতাল জরানো তেঁতুল খেয়ে ফেলে। পরদিনই ওঁর সর্দি আর গলাব্যথা, ননীবালা আঙুল তুলে কৌতুকের সুরে বলে—কেমন ? বলেছিলাম না ?কথা শোনা হল ? আমার কথা শোনা হবে কেন—আমি কি আরকেউ ?

—মাকে যেন কোনো কথা বোল না—

—ঠিক বলে দেবো। চালাকি বার করে দেবো দেখো। আর একটু তেঁতুল চলবে ? নিয়ে আসব নুন-নেবুপাতা দিয়ে ?

ননীবালার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে আঁচল দিয়ে, ছেলে পাছে টের পায়। আজ যদি তিনি থাকতেন। মরার বয়েস হয়নি তো। অনায়াসেই থাকতে পারতেন। আজ কি সুখের দিন তা হোলে। খোকা এত বড়হয়েছে, যে দেখে সে-ই ভালো বলে। দুদিন পরে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় রেলে ভালো চাকরি করবে। উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খান না কেন ! আমরা তাঁকে কাজ করতে দিতাম না।আরাম করে খান না ছেলের রোজগার। এই দুপুরে বসে বসেকত গল্প করতাম দুজনে। ছেলের বৌ সেবা করত, তেঁতুল জরিয়ে নিয়ে আসত।

পৃথিবীর পথে সে যেন একা।

সঙ্গী চলে গিয়েচে তাকে ফেলে।

দীর্ঘ পথ সামনে দূর থেকে বিস্তৃত। কে জানে কতদিন চলতে হবে এই টানা পথ বেয়ে ?

না, না, তার খোকা, তার সুরেশ আছে। বেঁচে থাক সে। তার ঘরকন্না গুছিয়ে দিতে হবে না ?আজ বাদে কাল সুরেশের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেমানুষ ওরা, সংসারের কি জানে ? তাকেই গুছিয়ে দিতে হবে সব।

সুরেশ এসে বললে—মা, একটু তেঁতুল জরাও না ? নুন দিয়ে, নেবুপাতা দিয়ে ?

ননীবালা চমকে উঠে ছেলের তরুণ মুখের দিকে চেয়েথাকে অবাক হয়ে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের জলরোধ করলে।

ছেলে কি করে জানলে তার বাবা অবিকল এমনি সুরে, এমনি টান দিয়ে কথা বলত ?

গ্রামে ফিরে আসা পর্যন্ত ওঁর প্রতি পদক্ষেপ যেন শুনতে পায়। কি জানি, কিছুই যেন ভালো লাগে না। সব যেন ফাঁকা, অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কোনো কাজে আর উৎসাহ নেই।

একদিন ওপাড়ার হরিদাস চক্কত্তির বাড়ি সত্যনারায়ণের পুঁথি শোনা ও প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণে সে পাড়ার ঝি-বৌদেরসঙ্গে গেল। সেকেলে কোঠাবাড়ি, দালানে পুজোর জায়গাহয়েচে, মাদুর পেতে দেওয়া হয়েছে নিমন্ত্রিতা মেয়েদের জন্যে। পুরুষেরা বসেচে বাইরের রোয়াকে। পূর্ণিমার রাত্রে উঠোনের বড় নারকোল গাছগুলোর ছায়া পড়েছে রোয়াকে। সদ্য তোলা যুঁই ফুলের সুগন্ধে ভুরভুর করচে পুজোর বারান্দা।

ছবিদাস চক্কত্তির বৌ বললেন—এসো এসো ভাই।কতদিন গাঁয়ে আসোনি, সেই একবার এসেছিলে অনন্তচতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের সময়, মনে পড়ে ?

ননীবালা বললে—খুব মনে পড়ে।

—তখন তোমার নতুন দু'এক বছর বিয়ে হয়েচে।

—দু'বছর হবে।

—চেহারা আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েচে।

—আর চেহারা দিদি ! কি দরকার আমাদের চেহারায় বলুন ! সে পাট তো ঘুচে গিয়েচে।

—আহা-হা, সে আর বোল না ভাই। ঠাকুরপো তোছেলেমানুষ। আমাদের ওঁদের চেয়ে কত ছোট। তার কি এখনযাবার বয়স হয়েছিল ?সবই অদেষ্ট, কি বলব বল!

ননীবালার দু'চোখ ততক্ষণে জলে ভরে গিয়েচে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, নয়তো জল গড়িয়ে পড়বে গালবেয়ে। সে একটা লজ্জার কথা এদের সামনে। তার মনে যেকি অভাব, সে কথা এরা কেউ বুঝবে না। সে মধুর অনুভূতির স্মৃতি এদের জীবনে পুঁজি নেই, স্থূল জীবনযাত্রা চালিয়ে যায় রান্না বাড়া করে, খাইয়ে, ঘরকন্না গেরস্থালি করে। তার মনেরসে অনুভূতির ধারণাই নেই এদের। চোখের জল দেখে ভাববেঢং করে কাঁদচে লোক দেখানোর জন্যে।

পাশের বাড়ির কানাই গাঙ্গুলীর পুত্রবধূ এসে বসল ওরপাশে। ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেললে। অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, একটিমাত্র মেয়ে, ন'মাস বয়েস।বাপের বাড়ি শান্তিপুরের কাছে হবিবপুর। বেশ শহুরে টান কথাবার্তায়। ওকে বললে—কাকীমা, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ভাবচি আজ ক'দিনই।

—আমার কথা কে বললে তোমায় ?

—সবাই বলে। আমার পিসশাশুড়ি বলছিলেন, বড় ভালো বৌ ছিল এ গাঁয়ের। গিয়ে দেখা করে এসো বৌমা।আপনার নাম কী কাকীমা?

—ননীবালা। তোমার ?

—প্রীতিলতা।

—বেশ নামটি। খুকির নাম কি ?

—এখনো কিছু রাখি নি। ডাকনাম টুলু। আপনার কাছে যাবো এখন, একটা নাম ঠিক করে দেবেন এখন আপনার নাতনীর !

—দেবো না কেন বৌমা, কালই যেয়ো। গান কর নাকি?

—গাই। সে তেমন কিছু না। আপনার মুখে শুনব। এইমাত্র ওরা বলছিল আপনি ভালো গান জানেন।

—আমি ?আমার গানের পাট তো চুকে গিয়েচে মা।আবার—

নাঃ, যখন তখন চোখে জল এসে বড় অপ্রতিভ করেদেয়, এইসব ছেলেমানুষ ঝি-বৌয়ের সামনে। তার কি এখনচোখ পানসে করে কাঁদবার বয়েস ?সে না গিন্নিবান্নি ? ছেলেরমা ?

প্রীতিলতা মেয়েটি বেশ দেখতে, কত আর বয়েস হবে—আঠারোর বেশি নয়। ননীবালা সামলে নিয়ে বললে—যেয়ো বৌমা। তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে তো আবার এগাঁয়ের মাটিতে পা দিলাম। যাবে বৈকি।

সব বেশ ভালোভাবেই চলছিল, এমন সময় আর একটিওর সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, তার নাম কনক, এপাড়ার কোনো এক বাড়ির মেয়ে, বোধহয় উপেন ভট্চাজের মেয়ে।কনক ছুটে এসে ওর হাত দুখানা চেপে ধরে বললে—মনে পড়ে বৌদি ?মনে পড়ে?

একে খুবই মনে পড়ে। স্বামীর ঘরে প্রথম প্রথম যাবারসময় এই মেয়েটি আর রায়চৌধুরী পাড়ার সুবাসিনী এই দুজনেকি অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই তাদের রুদ্ধ দুয়ারের বাইরে আড়ি পেতে বসে থাকত রাত দুপুর পর্যন্ত।

একদিন—না, সে সব কথা এখন মনেই চাপা থাক।

জুঁইফুলের গন্ধে ভরা দীর্ঘবিলসিত তাদের পুরনো বাতাসকোন্ দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এসব পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের জ্ঞানকাণ্ড বোধহয় একটু কম। নইলে সে যেটা প্রাণপণে চাপা দিতে চাইচে, ওরাসেটা খুঁটিয়ে তুলতে চাইবে কেন ?একটা সাধারণ বুদ্ধিও তোআছে ! কনক সামনে এলেই মনে পড়ে সে সব মাধবী-রাত্রির টাটকা জুঁই-চাঁপার গন্ধ। কেন এরা সামনে আসে ? ননীবালামুখে অতি কষ্টে হাসি টেনে বললে—হ্যাঁ ভাই, কনক ঠাকুরঝি।ভালো ?

—ভালো। তুমি ?

—দেখতেই পাচ্চ।

—তা তো দেখচি। আহা, মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। সেদিনের কথা। সেই রাত্রে দাদা আমার মুখে খড়িগোলা মাখিয়ে দিলে আড়ি পাতবার জন্যে, মনে পড়ে ?

না, এদের যেন আর কোনো কথা নেই আজকার দিনে। ননীবালা চুপ করে রইল দেখে কনক বোধহয় কিছু অপ্রতিভহল। সেও চুপ করে গেল।

খুব লোকজনের ভিড়। দালানের মধ্যে মেয়েদের প্রসাদখাবার পাতা সাজিয়ে দেওয়া হল। ননীবালা এবং অন্যান্য মেয়েরা সেখানেই বসলো। সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়া আরম্ভহল।

খানিক পরে সেখানে একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে এসেদাঁড়াল। বৃদ্ধের বাঁ হাতে একটা বাটি। বৃদ্ধ এসে বলল—পুজোহয়নি ?

হরিদাস চক্কত্তির ছেলে বললে—না। আসুন জ্যাঠামশায়।বসুন—

—মেয়েদের মধ্যে আর বসব না। যাই বাইরে। কত দেরিহবে ?

—বেশি দেরি হবে না জ্যাঠামশায়।

—আবার বাড়ি গিয়ে রুটি করতে হবে, তবে খাবো।বেশি রাত্তির না হয়।

ননীবালা পাশের কাউকে জিগ্যেস করলে—উনি কেভাই ?

সে বলল—চাটুজ্যে বুড়ো। ছেলেরা মস্ত রোজগেরে, কলকাতায় থাকে। বুড়ো বাবা এখানে পড়ে আছে, খোঁজওনেয় না।

—বৌ বেঁচে নেই বোধ হয় ?

—খুব আছে। ছেলেদের কাছে কলকাতায় থাকে।

—ইনি যান না কেন ছেলেদের কাছে ?

—তা কি জানি দিদি। তা বলতে পারিনে। এখানে থাকে, তাই তো দেখি—আর তুমিও যেমন ! নিজের খবরই রাখতেপারি নে, তার আবার পরের খবর নিতে যাচ্চি !

রাত অনেক হয়ে গেল পুজো ও পুঁথি-পড়া শেষ হতে। ননীবালা যখন ছেলের সঙ্গে বাড়ি যায়, তখন দেখতে পেলে সেই বৃদ্ধ ওদের আগে আগে চলেচেন লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতেকরতে। ওদের দেখে বললেন—কে যায় ?তোমাদের তো বাবাচিনতে পারলাম না ?

সুরেশের পরিচয় পেয়ে বড় খুশি হলেন। তাকে কত আশীর্বাদ করলেন, ননীবালাকে বললেন—তোমার বিয়ের পর একবার বৌমা তোমায় দেখেছিলাম—বিয়ের বৌভাতের দিন।যেয়ো আমাদের বাড়ি, কেমন ?কালই যেয়ো।

পরদিন বিকেলে ননীবালা চাটুয্যে বুড়োর বাড়ি গেল। সামনে বারান্দাওয়ালা সেকেলে কোঠাবাড়ি, একদিকে ডুমুর গাছ অন্যদিকে একটা বাতাবি নেবুর গাছ—উঠোনের পুবদিকে একটা পেঁপেগাছে অনেকগুলো পেঁপে ধরেচে।

বুড়ো বললে—কি দেখচ বৌমা, ও সব আমার নিজের হাতে করা। সবাইপুরের বিশ্বেসদের বাড়ি থেকে বীজ আনিয়েছিলাম আজ ন'বছর আগে। সেই গাছ। তখন ওরা সবএখানে ছিল।

ননীবালা বললে—ওরা কারা জ্যাঠামশায়?

—তোমার জেঠিমা।

—আপনাকে এখানে রেঁধে দেয় কে ?

—নিজেই। খুব ভালো রাঁধতে পারি। এই এখন বসেপরোটা করবো।

—জেঠিমা থাকেন না এখানে ?

—না না। ওরা বড় ছেলের কাছে থাকে কলকাতায়।

—ক' ছেলে আপনার ?

—তিনটি। তা নিজের মুখে বলতে নেই, তিন ছেলেভালো চাকুরিই করে। শ্যামবাজারে তেতলা বাসা। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। বড় ছেলের মোটর গাড়ি। দশে মানে, দশে চেনে। চাটুয্যে সায়েব বললে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের একডাকে সকলে চেনে। চেহারাও একেবারে সায়েবি—নিজের ছেলেবলে বলচি তা ভেবো না—

বৃদ্ধের মুখে-চোখে গর্বের ভাব অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজের মনে আপনা-আপনি হেসে উঠে বললেন—জন্মাবারপরে এতটুকু ছিল। ওর মান ফুলেনবলার পাঁচু ঠাকুরের দোরধরে তবে ওই ছেলে বাঁচায় ! ছ'বছর বয়সে কাঁকড়াবিছের কামড়ে ছেলে নীলবর্ণ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কাঁটানটের শেকড় বেটে খাইয়ে জলপড়া দিয়ে তেলপড়া দিয়ে সেযাত্রা অতিকষ্টে রক্ষা হয়। তবে আজ আমাদের নৃপেন—তাএসো, বোসো বৌমা। এই পরোটা কখানা ভাজি আর তোমারসঙ্গে গল্প করি।

একটা ক্ষুদ্র ভাঁড়, চেঁচে-মুছেঘি বেরুলো আধ ছটাকখানেক।

বৃদ্ধ ভাঁড় দেখিয়ে বললে—দালদা। ভালো দালদা। আর তা ছাড়া পাচ্চি কোথায় ?শ্রীঘি আট টাকা সের।

—কেন আপনার ছেলে টাকা পাঠায় না ?

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—নৃপেন ?তার অনেকখরচ। রোজগারও যেমনি, খরচও তেমনি। আমি আর তাকে বিরক্ত করিনে। আমার বিঘে তিনেক ধানের জমিআছে, আর ধরো লাউ করি, কুমড়ো করি, ঢেঁড়স ডাঁটা—সব তৈরি করি নিজের হাতে। বেশ চলে যাচ্চে। নৃপেন পুজোর সময় একখানা ভালো থান কাপড় পাঠিয়ে দিয়েচে—ফাইনথান—তা বৌমা সে আমি তুলে রেখে দিয়েছি। বার বার দেখি, বলি বড় খোকা আমায় দিয়েচে। ছোট ছেলের বাসা আগে ছিল কলকাতায়—এখন মণিপুরে। সে একজোড়া চটিজুতো পাঠিয়ে দিয়েছিল পুজোর সময়।

ননীবালা ইতিমধ্যে পরোটা কখানা বেলে দিয়ে বললে— আপনি ভেজে নেবেন, না আমি দেবো ?

—না মা, আমিই নিচ্চি।

—কেন, কষ্ট করবেন ?সরুন—আমি করে দিচ্চি।

ননীবালা খাবার তৈরি করে জ্বাল দিয়ে সিঁড়ি পেতে বৃদ্ধকে যত্ন করে খেতে বসিয়ে দিলে। চাটুয্যে বুড়োর মুখের ভাব দেখে মনে হল অনেকদিন তাকে এমন যত্ন করে কেউ খাবার করে খাওয়ায় নি।

বুড়ো বললে—কি সুন্দর পরোটা হয়েছে। মেয়েমানুষ নাহলে কি খেয়ে তৃপ্তি ? মেয়েদের হাতের রান্নাই আলাদা। বেঁচে থাকো বৌমা, বেঁচে থাকো। মুখ বদলালাম অনেক দিন পরে।

—আপনার ছেলেদের বৌ কেউ এখানে থাকেন নাকেন ?

—না, না, পাগল। তাদের কি এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে বলতে পারি ?তুমি জানো না, এসব অশিক্ষিত স্থানে তাদের আসতে বলতে পারি না। তাদের মন টেকে এখানে ?গরিব ছিলাম নিজে বটে কিন্তু ছেলেদের মানুষ করে দিয়েছি কষ্ট-দুঃখ করে। বিয়েও দিয়েছি তেমনি ঘরে। বড় বৌমার বাবা মতিহারিতে সিভিল সার্জন। মেজ বৌমার বাবা নেই, মামারা খিদিরপুরে বড় কনট্রাকটর, রায়চৌধুরী কোম্পানির নামশুনেছ ?সেই রায়চৌধুরী কোম্পানি। ছোট বৌমার বাবা এখন বাঁক্ড়োর সদর এস.ডি.ও.। বড় বৌমা ম্যাট্রিক পাস। ছোট বৌমা বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, পরীক্ষা দেন নি। ইংরিজি বলেন কি ! আড়াল থেকে শুনেচি—যেন মেমসাহেব ! হুঁ হুঁ বৌমা—এসব গল্পকথা এখান থেকে শোনাবে। নিজের চোখে না দেখলে—

—তাঁরা কখনো এখানে আসেন নি?

—বড় বৌমা এসেছিলেন একবার পুজোর সময়, যেবার আমার বড় নাতির ভাত হয়। প্রথম ছেলের ভাত এখান থেকেই হয়েছিল কিনা ! সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সে নাতি এবার ডাক্তারি পড়ছে মেডিকেল কলেজে। ওর পরে দুইমেয়ে, তারা ইস্কুলে পড়ে। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে একটি।ছোট বৌমাকে নিয়ে আমার ছোট খোকা এসেছিল সেবার মোটরে করে, ঘণ্টা চারপাঁচ ছিল সবাই। আমি অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি পেয়ে বৌ নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। ছোট বৌমা এসে শুধু ডাব আর চা খেয়েছিলেন—পাড়াগাঁয়ের জল খেলেই ম্যালেরিয়া হবে। তাদের অবস্থা ভালো, শিক্ষিত, সব বোঝে তো। রাত কাটালো না এখানে। কোথায় বা শুতে দিতাম—না বিছানো, না মশারি। নিজে শুই একটা ছেঁড়া মশারি টাঙিয়ে। সারারাত মশা কামড়ায়, নিজে ভালো দেখতে পাই নে চোখে যে সেলাই করবো।

—আমি কাল আপনার মশারি সেলাই করে দিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

—তা বেশ। এসো বৌমা। একটু গুড় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারো ? খাবার ইচ্ছে হয়, এবার কিনতে পারি নি। বড্ড দাম। পরোটা দিয়ে খেজুরের গুড় লাগে বড় ভালো।

খাওয়া শেষ করে চাটুয্যে বুড়ো তামাক সাজতে বসলো। ননীবালা চলে এল। তার মনে সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব।

সুরেশকেসে খেতে দিলে। সুরেশ বল্লে–বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে মা, এখানে বোসো।

ননীবালা বল্লে—তাকে তোর মনে পড়ে ?

—খুব। আমায় নামতা পড়াতেন রোজ সকালে উঠে।বাবা যদি আজ থাকতেন। সুরেশের গলার স্বর ভাঙা, আবেগে আড়ষ্ট।

ননীবালা ভাবলে, এই ভালো, এই ভালো। খোকা আজ তোমার নাম করচে, তুমি নেই বলে। ওর চোখের জলে তোমার স্মৃতি সার্থক হোক। বেঁচে থাকো মানে—মানে খোকার মনে। মন শুকিয়ে যায়, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো চাটুয্যে জ্যাঠামশায়ের মতো তোমাকেও অবহেলা পেতে হোত। ভালোই হয়েচে তুমি মানে-মানে চলে গিয়েচো।